রাংতা

সিতেশবাবু প্রাতরাশ সেরে চেম্বারে এসে দেখেন গিন্নি আদুর গায়ে আটপৌরে শাড়ি জড়িয়ে ঝাঁটপাট দিচ্ছেন তখনও। অপ্রসন্ন মুখে আড়চোখে ঘড়ি দেখলেন সিতেশবাবু। আটটা বেজে গেছে। রুগীদের আনাগোনার সময় হয়ে গেছে, যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারে যে কেউ। ডাক্তার গিন্নিকে বিস্রস্ত বেশবাসে ঝাঁটা হাতে ঝাঁটপাটে লিপ্ত দেখে হবু রুগীদের ডাক্তার সম্বন্ধে কতখানি ভক্তি শ্রদ্ধা বাকী থাকবে সে প্রশ্ন বাদ দিলেও গেরস্ত বাড়ির আব্রু বলে একটা জিনিস আছে। গৃহিণী সুবাসিনীকে সে কথা স্মরণ করানো বৃথা।

সাত সকালে রান্নাঘর মুক্ত করে তোলা উনুনে রুটি কুমড়োর ছেঁচকি নামানোর ঝক্কিতে এমনিতেই তেতে আছেন মনে মনে। চেম্বার সেরে বাড়ি ঘর পরিষ্কার করে স্নানটান করে ধোয়া শাড়ি সেমিজ পরবেন একেবারে। ততক্ষণে দশটা বেজে যাবে। সকালে উঠে পটের বিবি সেজে বসে থাকার কপাল করেননি সুবাসিনী। সিতেশবাবু মনে মনে সুবাসিনীর ঝাঁঝালো উত্তরটা ঝালিয়ে নিয়ে শেষমেশ গিন্নির সাজ-সজ্জা নিয়ে উচ্চ-বাচ্য করেন না আর। সহিষ্ণু মুখে এক পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন আর সুবাসিনী একমনে হাত চালিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ঘরের মধ্যে পর-পুরুষের পদার্পণে সাঁৎ করে কক্ষান্তরে লুপ্ত হয়ে যান রোজ দিনের মত। এর পর এক দুই করে গুটিকয় রুগী জমায়েৎ হতে থাকে।

বসত বাড়ির বৈঠকখানাটিতে চেম্বার খুলে সিতেশবাবু অবসরপ্রাপ্ত দিন যাপনের ব্যবস্থা করেছেন কোন মতে। দুধেভাতে না হলেও ডালভাতের সংস্থান হয়ে যায়। ছেলে দু'টি চাকরি-বাকরি করে স্থানান্তরে। এই মাগ্যি গণ্ডার দিনে মা-বাবাকে সাহায্য করার মত আহামরি চাকরি নয় তাদের। তবে চুরি-বাটপারি না করেও বৌ-বাচ্চা সমেত মধ্যবিত্ত জীবন কাটাচ্ছে তারা। টাকা-পয়সা না দিক, বাবা-মাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।

ছুটি-ছাটায় সপরিবারে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসে, চিঠি-পত্র লেখে নিয়মিত এবং দূরে থাকলেও নাড়ির টান যে ছিন্ন হয়নি তাদের বাহ্য ব্যবহারে বোঝা যায় তা। সে দিকে সিতেশবাবুর কোন ক্ষোভ নেই। বলতে কি এ যাবৎ সব দিক দিয়েই নিজেকে মোটামুটি সুখী ও সফল বলে মনে করে এসেছেন তিনি। শুধু ইদানীংই মাঝে মাঝে মনের মধ্যে কেমন যেন চিড়-খাওয়া একটা ভাব চাগাড় দিয়ে ওঠে।

সিতেশবাবু রুগী দেখার ফাঁকে জানলার বাইরে অন্যমনস্ক দৃষ্টি চালিয়ে দেন। রাস্তার উল্টো দিকে চৌখুট্টি লনওলা বাড়ি। বোগনভিলা দিয়ে একাংশ ঢাকা পড়ে গেছে। কাঁটা তারের উপর বিচিত্র বর্ণের লতা গাছ এঁকেবেঁকে ঘিরে রয়েছে চারদিকে। সাদা ঝকঝকে পেণ্ট করা লোহার গেটের উপর সুদৃশ্য নেমপ্লেট। মনে মনে হিসেব করলেন সিতেশবাবু। হ্যাঁ, সামনের মাসে এক বছর পুরবে। এক বছর আগে বসাক পরিবার ওঁদের প্রতিবেশী হয়ে এসেছেন এ পাড়ায়। কোন বিদেশী কোম্পানীর এক্সিকিউটিভ্ মিঃ বসাক। বাড়ি গাড়ি সারভেণ্টস্ কোয়ার্টার্ - কোন কিছুর অভাব নেই। এ বাড়িতে এসে যেন পাড়াটারই ভোল পাল্টে দিলো ওরা। ফিটফাট কেতাদুরস্ত এই পরিবারের পদার্পণে হঠাৎ আত্মসচেতন হয়ে উঠলো সবাই। যেন নতুন একটা হাওয়া, একটা তরঙ্গ দোলা দিয়ে গেল সবাইকে। বাড়িতে বাড়িতে নতুন পলেস্তারা, অন্তত পক্ষে দরজা জানলায় নতুন এক সেট বাহারে পর্দা, দরজার কাছে নিদেন পক্ষে কিছু গোলাপ কি পাতাবাহারের গাছ।

সিতেশবাবু জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এ পাড়ায় একটা বাড়িতে শুধু কোন পরিবর্তন নেই। সুবাসিনী সাত সকালে উঠে আদুর গায়ে রান্নাঘর নিকিয়ে, তোলা উনুনের ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার করে তোলেন বাড়িময় আর খুলে আসা শাড়ির খুঁট কোমরে গুঁজতে গুঁজতে অনর্গল নালিশের খাতা উজাড় করে ধুলো ঝাড়েন একপ্রস্থ প্রতিদিন। অথচ ওই মিসেস বসাক সুবাসিনীর বয়সীই হবেন হয়তো, দু-পাঁচ বছর এদিক ওদিক শুধু।

সুবাসিনী বলেছিলেন, "মরে যাই! বুড়ো বয়সে আবার বাহার কত!"

সিতেশবাবুরও চমক লেগেছিল মিসেস বসাককে দেখে। হ্যাঁ, এই চেম্বারে এসেছিলেন মিসেস বসাক। পায়ে হেঁটে, কোলে ধবধবে সাদা পোষা কুকুরটাকে নিয়ে। সুবাসিনীর বয়সীই ভদ্রমহিলা, দু-পাঁচ বছর হয়তো বেশী-কম হতে পারে। বেশীই হবে হয়তো। ধ্যাবড়া নীল রঙের ফ্যাশনদুরস্ত জীন্‌সের উপর ফিনফিনে পাতলা ব্লাউজ। ভিতরে এক চিলতে অন্তর্বাস শুধু। কালো টানা টানা ভুরুর সবটাই ভুরু নয়, পেন্সিলের কারিকুরি স্পষ্ট বোঝা যায় তবু মন্দ লাগে না। গালের পাশ দু'টো একটু যেন ঝুলে পড়েছে কিন্তু মাজা-ঘষার কমতি নেই তা বলে। সব মিলিয়ে কেমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন সিতেশবাবু। ব্যক্তিগত কিছু নয়, তবু শক্তিশালী একটা অনুভূতি নাড়া দিয়ে গেছিল তাঁকে। অবশ্য প্রথম দিন পুরোপুরি অনুভব করেননি অতটা। একটু বিস্ময় বা হতচকিত ভাব। মহিলা যখন অনায়াসে বললেন, "দেখুন, আমি জানি আপনি 'ভেট্' নন। কিন্তু ডাক্তার যখন, সব রকম জ্ঞানই তো আছে। আমার টিপ্‌সি তিন দিন থেকে খাচ্ছে না, পটি যাচ্ছে না, এদিকে 'বস্‌কি' আউট্ অফ স্টেশন্। ভারি বিপদে পড়ে এসেছি আপনার কাছে। আফটার্ অল্ ইউ আর্ মাই নেবার্ ----" সিতেশবাবু নিজের চেম্বারে বসেই বিহ্বল বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লেন। এবং শশব্যস্তে কুকুরের পরিচর্যায় লেগে গেলেন হাতের রুগীদের স্থগিত রেখে ----।

পর দিন বিকেলের দিকে বাজারমুখো হাঁটতে হাঁটতে কখন যে উল্টো দিকের সাদা গেটের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন তা লক্ষ্যই করেন নি সিতেশবাবু। হঠাৎ কলকণ্ঠের সম্বর্ধনায় উচ্চকিত হয়ে উঠলেন, "এই যে আসুন। রুগীর খবর নিতে এসেছেন তো? টিপ্‌সি, টিপ্‌সি!" আজ আর জীনস্ নয়, শরৎকালের মেঘের মত হালকা ভাসা ভাসা একটা সেমিজ পড়েছেন মিসেস বসাক। ফিকে রঙের বেগনী গোলাপী নীলাভ ফুলপাতা ঘিরে রয়েছে ছিপছিপে তন্বী দেহখানাকে। সিতেশবাবু মনে মনে ঢোক গিললেন। পঁয়তাল্লিশ, আটচল্লিশ কত বয়স হবে মিসেস বসাকের? আর সুবাসিনী? ষোড়শী কন্যা স্বল্প দেড় দু'মাস 'ওগো বধু সুন্দরী'র ভূমিকা স্পর্শ করে রাতারাতি বেঢপ ঢিলেঢালা গিন্নি হয়ে বসে আছে সেই কোন যুগান্ত ধরে। আরও কিছুদিন যৌবনের রূপ-রস-গন্ধ ধরে রাখলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত? এত তড়িঘড়ি সব কিছু নিঃশেষ করে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকার কি কোন সার্থকতা আছে, কোনও মাহাত্ম্য?

বিবাহিত জীবনের গোড়া থেকে সেই যে "সংসার কঠিন ঠাঁই, হাসি নাই রঙ্গ নাই"-এর বিমর্ষ তানে যাত্রা শুরু হয়েছে, চিতায় ওঠা তক্ এর থেকে রেহাই নেই বুঝি। অথচ সিতেশবাবুর সুখী জীবনের মালমশলা কিছু কম ছিল না - ভাল চাকরি, সম্পন্ন আত্মীয় স্বজন, দিলদরাজ মন মেজাজ। দাম্পত্য জীবনের জাঁতাকলে পিষে রস বার করা আখের ছিবড়ের মত কাটখোট্টা বিজ্ঞ প্রবীণ পিতামহ ব্রহ্মা হয়ে কি পেলেন জীবনে? আর ওই মিসেস বসাক ----।

বসাক পরিবারের অন্দরমহলে পদার্পণ করে আরেক দফা চমক লাগে সিতেশবাবুর। ঝকঝকে গেটের অভ্যন্তরের প্রতিটি জিনিস বহু যত্ন বহু পরিচর্যা দিয়ে সাজানো। লনে খাটো সমান মাপের নধর ঘাস, কেয়ারিতে নানা বর্ণের ফুল, বারান্দায় কারুকার্য করা ঝুলন্ত টবে বিচিত্র ক্যাক্টাস্, ড্রয়িংরুমের চোখ-ধাঁধানো সাজ-সরঞ্জাম - সবাই মিলে যেন সাদামাটা ঘরোয়া পাড়া থেকে হঠাৎ ইন্দ্রসভায় টেনে নিয়ে গেল তাঁকে।

সেদিন বাড়ি ফিরে এবং তারপর থেকে এ যাবৎ বহুবার এ নিয়ে গভীর চিন্তা করেছেন সিতেশবাবু। নিজেকে দারুণভাবে বঞ্চিত বোধ করেছেন মনে মনে। জীবন তো তাঁরও ছিল। এই ছাপান্ন বছর বয়সে এখনও নখ-দাঁত নিয়ে দিব্যি সুস্থ সমর্থ আছেন দৈহিক ভাবে। অথচ জীবনের প্রাক্কালে তড়িঘড়ি অকালবৃদ্ধের ভেক ধারণ করে বসে রইলেন। আর ওঁদেরই সমকালীন বসাকরা আজও চিরহরিৎ হয়ে আছে কোন যাদুমন্ত্রে? অনেক ভেবে ভেবে সিতেশবাবু বুঝেছেন দোষ তাঁর যতটা তার থেকে ঢের বেশী দোষ সুবাসিনীর। উনি তো দশটা পাঁচটা অফিস করে খালাস, সংসারের কর্ণধার ছিলেন সুবাসিনী। তিনি সংসারটাকে যে ভাবে গড়েছেন, সিতেশবাবু নির্দ্বিধায় নিজেকে খাপ খাইয়ে চলেছেন শুধু। প্রাথমিক গৌরচন্দ্রিকার মধুচন্দ্রিমার পর, সংসারটা যে স্রেফ কাঁথা কাপড়ের ডাং, উঠোন নিকোনো আর তোলা উনুনের ধোঁয়া এ জ্ঞান সিতেশবাবু লাভ করেছেন অর্ধাঙ্গিনী সুবাসিনীর কাছেই। সুবাসিনী যদি এরকম নীরস, নালিশপরায়ণা না হয়ে এ বয়সেও জীন্সের উপর ফিনফিনে ব্লাউজ আর সংক্ষিপ্ত অন্তর্বাস পরতেন, বিলুপ্তপ্রায় ভুরু পেন্সিল দিয়ে মেরামত করতেন, সংসারকে ইন্দ্রসভা করে রাখতেন তবে ---- তবে ---- সিতেশবাবু ঢোক গিলে কল্পনাস্রোতে যবনিকা টানেন। কোন লাভ নেই ভেবে অনুশোচনা করে আর কপালে করাঘাত হেনে। যার যা

বরাত তা ফেরাতে পারে না কেউ। আজীবন ভুগে যেতে হবে ভোগান্তি যা লিখেছেন বিধাতা।

চেম্বার বন্ধ করে ভিতর-বাড়িতে এসে দেখেন সুবাসিনী চোখে চশমা এঁটে সেলাই-পত্তর বিছিয়ে বসেছেন। প্রবাসী নাতি-নাতনীদের পুজো উপলক্ষে পোশাক-আশাক পাঠাবেন প্রতি বছরের মত। তারই তোড়জোড়।

সিতেশবাবুর সাড়া পেয়ে ওমনি স্বগোতোক্তি শুরু করলেন, "চশমা না ছাই। চোখের বারোটা বেজে গেল। তা কারই বা মাথাব্যথা পড়েছে, পাড়া প্রতিবেশীর চিকিচ্ছে করে সময় পেলে তো ! আমারও যেমন মরণ হয় না।"

সিতেশবাবু হাত ধুয়ে নিঃশব্দে খাবার জায়গায় গিয়ে বসলেন। শুক্তো থেকে শুরু করে শেষপাতে দই পর্যন্ত কানের কাছে এই ধানাই-প্যানাই চলবেই। খেয়ে উঠে খবরের কাগজ পড়ে একটু গড়িয়ে নেবেন সিতেশবাবু। তারপর বৈকালিক চা-পানের পর চেম্বারে গিয়ে নিষ্কৃতি পাবেন, কৃষ্ণের বাঁশির বিরতি হবে সাময়িক ভাবে। রাত্রে ঘরে ফিরে আবার আর এক দফা কীর্তন শুনতে হবে যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়েন সুবাসিনী। ঘুম আসতে চায় না সিতেশবাবুর চোখে। অন্ধকারে চোখ মেলে নিজের ছারখার জীবনের উদ্দেশে হা-হুতাশ করেন বহুক্ষণ ধরে। তারপর কোনও একসময় ঘুমিয়ে পড়েন।

সামনের বাড়ির বাসিন্দাদের বেশ কিছু দিন হ'ল দেখা যাচ্ছে না। লনে মালি কাজ করে দু'বেলা, সকাল-সন্ধ্যা বাচ্চা চাকরের সঙ্গে টিপ্‌সি পাড়া প্রদক্ষিণ করে আসে বাঁধা নিয়ম মাফিক। ঝি আর বাচ্চা-কাচ্চারা গেটের মধ্যে দিয়ে বাড়ির পিছন দিকে যাওয়া-আসা করে। শুধু বসাক দম্পতিই নিখোঁজ। ছুটি-ছাটায় গেছেন হয়তো সমুদ্র সৈকতে কিংবা কোন পাহাড়ি এলাকায়, কিংবা আত্মীয় পরিজনের কাছে কোন শুভ উপলক্ষে শুভেচ্ছা বহন করে। ফোঁস করে একটা জোরালো দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন সিতেশবাবু। এক কালে দারুণ ভ্রমনপ্রিয় ছিলেন। যে কোন অজুহাতে ট্রেনে চড়ে বসতেন যে কোনও সময়। সে সব কবে ঘুচে গেছে। দেশ ভ্রমনে বেরুবার প্রস্তাব করলে এখন সুবাসিনী মাথার চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দিয়ে বসবেন নির্ঘাত। আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে পরিমিত সম্বন্ধ ছকে বাঁধা গুরু গম্ভীর কর্তব্য সাধনেই সমাপ্ত এখন। হুট্

করে হঠাৎ কারো কাছে গিয়ে দু'টো দিন হৈ-হুল্লোড় আনন্দ করে আসা - সে সব বাতিক কোন কালেই প্রশ্রয় দেননি সুবাসিনী। ফলে প্রথম বয়সের সেই অকারণ উল্লাস, বেহিসাবী উৎসাহ অযত্নে অসম্মানে শুকিয়ে ঝরে গেছে বহু দিন।

সকাল থেকে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। রুগী সমাগমে মন্দা পড়েছে আজ। শূন্য চেম্বারে বসে খবরের কাগজের পাতা ওলটাচ্ছিলেন সিতেশবাবু। একটি স্ত্রীলোক দু'টি বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করলো। এক জনকে কোলে নিয়ে, অন্য জনের হাত ধরে। কাগজ সরিয়ে রেখে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন সিতেশবাবু।

"ডাক্তার সাহেব আমি সামনের বাড়ির আয়া"

সিতেশবাবু চিনতে পারলেন তাকে। বসাকদের বাড়ি এই স্ত্রীলোকটিই ট্রেতে করে কফি, কাজুবাদাম সামনে ধরেছিল। এর নাম শান্তি।

"কি ব্যাপার?"

শান্তি কান্নাধরা গলায় বললো, "আজ আট দিন ধরে বাচ্চাটার জ্বর। অ্যাস্পিরিনের বড়ি দিয়েছিলাম, কিছু ফল হয়নি।"

সিতেশবাবু বড় ছেলেটাকে দেখছিলেন এতক্ষণ। কাঠির মত সরু সরু হাত-পা, প্রকাণ্ড বড় মাথা আর ঢলঢলে এক জোড়া কাজল-টানা চোখ। সবটুকু জীবনীশক্তি ওই চোখেই কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। শান্তির কথা শুনে ছোট ছেলেটির দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর দেখলেন। খুঁটিয়ে নানান প্রশ্ন করলেন। যা ভেবেছিলেন তাই। টাইফয়েড। এমনিতেই বয়স অনুপাতে তেমন বাড়ন্ত গড়ন নয়। তায় এতদিনের জ্বর। চিন্তিত মুখে প্রেস্ক্রিপ্শন্ লিখে ওষুধ-পথ্য বুঝিয়ে দিলেন ভাল করে। আঁচলের গিঁঠ খুলে পাঁচ টাকা বের করে টেবিলের উপর রেখে শান্তি যাবার উপক্রম করতে হাত নেড়ে থামালেন তাকে।

"ওই বড় ছেলেটার বয়স কত?"

"জী, তিন বছর."

"এই দু'টো ছেলে তোমার?"

"আজ্ঞে না, পাঁচ ছেলে আর দুই মেয়ে।"

ভারী অবাক হলেন সিতেশবাবু, "সবাই তোমরা ওই বাড়িতে

থাকো? কই, বাচ্চাদের দেখি না তো?"

শান্তি কুণ্ঠিত স্বরে বলে, "ওরা ঘরের মধ্যে থাকে সারা দিন। মেমসাব গোড়াতেই বলে দিয়েছেন লনে না আসতে। একপাল বাচ্চা হৈ হুল্লোড় করে কম্পাউণ্ড নোংরা করবে, কানের কাছে উধম মচাবে তা চলবে না। আমার ছেলেমেয়েরা ভারি বাধ্য ডাক্তার সাহেব। পিছনের ওই ঘরখানা ছেড়ে কস্মিনকালে বেরোয় না। সাহেব মেমসাহেবের ভয়ে রা কাড়ে না। কেউ বুঝতে পারে না এতগুলো প্রাণী ওই একখানা ঘরে থাকি।"

"ওরা কেউ স্কুলে যায় না?"

শান্তি কুণ্ঠিত মুখে বলে, "ওদের লেখাপড়া শেখার খুব শখ কিন্তু ওরা স্কুলে গেলে ঘরের কাজকর্ম করবে কে? বড় ছেলে আর আমি সারাদিন সাহেবের বাড়ি কাজ করি। আমার স্বামী সাহেবের অফিসে চাপরাশি। সকাল বিকেল বাগানের কাজও করতে হয় তাকে। নিজের সংসারের কাজপাট তো ছেলে মেয়েগুলোই সামলায়। তা ছাড়া কোলের বাচ্চা দু'টোকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে চুপ রাখাও এক মস্ত কাজ। মেমসাহেব বাচ্চাদের কান্না-টান্না একদম পছন্দ করেন না। এরা তো আর তা বোঝে না। একলা ছাড়লেই হুলস্থূল কাণ্ড বাঁধাবে। দাদা দিদিরাই সামলে-সুমলে রাখে এদের। শান্তি চলে গেল। সিতেশবাবু কিছু বললেন না কিন্তু মনে মনে বেশ একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন তিনি। ছোট্ট বাচ্চাটার আটদিন থেকে জ্বর। টাইফয়েড। কিন্তু ওর উপরের বাচ্চাটার চেহারা অমন কেন? ভেবেছিলেন শান্তিকে সাবধান করে দেবেন। কিন্তু তা আর করা হ'ল না।

এরপর দু'দিন আর শান্তির দেখা নেই। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পর চেম্বার থেকে বেরিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন সিতেশবাবু। গেট খুলে ভিতরে ঢুকে লন পার হয়ে বাড়ির পিছন দিকে এসে এদিক ওদিক তাকালেন। চারিদিকে অন্ধকার। অতগুলো ছেলেপুলে সমেত মানুষগুলো গেল কই?

গলা ঝেড়ে ডাকলেন, "শান্তি ! শান্তি !"

কেমন যেন বেখাপ্পা শোনালো আওয়াজটা। তাড়াতাড়ি শুধরে নিলেন সিতেশবাবু।

তারপর সতেজ গলায় হাঁক পাড়লেন, "টিপ্‌সি! টিপ্‌সি!"

দূরে ঘেউ ঘেউ আওয়াজ হ'ল। বাইরের রাস্তা পার হয়ে টিপ্‌সির

চেন ধরে বাচ্চা চাকরটা ওর দিকে এগিয়ে এলো।

"শান্তি কোথায়? ওর ছেলের জ্বর হয়েছিল।"

ছেলেটি টিপ্‌সিকে নিয়ে অন্ধকার ঘরখানার কাছে গিয়ে ডাক দিলো, "আম্মা, ডাক্টর সাহেব আয়ে হ্যাঁয়।"

টিনের একটা ডিবে হাতে করে শান্তি দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো ডিবের শীর্ণ পলতে থেকে আবছা আলো আর রাশি রাশি ধোঁয়া বেরুচ্ছে। শান্তি সিতেশবাবুকে দেখে কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে মোটা গলায় গর্জন করে উঠলো কেউ।

শান্তি শশব্যস্তে বললো, "হ্যাঁরে কিষণ, আবার তুই টিপ্‌সিকে অন্ধকারের মধ্যে এদিকে এনেছিস? মেমসাব মানা করে গেছে না? সাপে কাটলে আমাদের আর রক্ষে থাকবে না।" কিষণ টিপ্‌সিকে নিয়ে সবেগে প্রস্থান করলো।

সাপের কথা শুনে সিতেশবাবু চটপট ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন। আধো অন্ধকারে ভালো করে কিছু ঠাহর হয় না।

শুধোলেন, "বাচ্চাটা কেমন আছে? ওকে দেখাতে নিয়ে যাওনি কেন?"

শান্তি অপ্রস্তুত গলায় বললো, "আমার ভারি বিপদ ডাক্তার সাহেব। পরশু রাতে কিষণের বাপ পা হড়কে পড়ে ভারি জখম হয়েছে। বেদম জ্বর ছিল দু'দিন। আজ অফিসের ডাক্তার ইন্জেক্‌শন্ দিয়ে পট্টি বেঁধে দিয়েছে। ডিবের ধোঁয়াটে আলোয় মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছিল সিতেশবাবুর। ভাল করে চেয়ে দেখলেন ঘরের এক কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়ে পড়ে আছে একটা লোক। এ বাড়িতে মালির কাজ করতে দেখেছেন যাকে। ব্যাণ্ডেজ করা পা-খানা পাশ বালিশের মত সটান লম্বা করে রেখেছে। হাত তুলে সেলাম করলো।

সিতেশবাবু প্রশ্ন করলেন, "এক্স-রে করাওনি?"

"আজ্ঞে ডাক্‌টর্ বলেছে আরও দু'টো দিন দেখতে। আরাম না হ'লে সোমবার দিন আবার যেতে বলেছে। বড্ড ব্যথা। ফুলেও গেছে অনেকটা। হাড়-ফাড় ভাঙলো কি না কে জানে।"

"কোথায় পড়ে গেলে?"

"আর বলেন কেন সাহেব, এই ঘরের দোড়-গোড়ায়। রাত্রিবেলা ফিরছিলাম। সিঁড়িটা ঠাহর হয়নি। এই একরত্তি একটা সিঁড়ি। বেকায়দায় হুড়মুড় করে পড়লাম একেবারে পুরো ওজন দিয়ে ওই পায়ের উপর ----।"

অন্ধকার সয়ে এসেছে খানিকটা। ঘরের আনাচে কানাচে অনেকগুলো মুখ। বিবর্ণ শীর্ণ মুখে ঢলঢলে একজোড়া করে চোখে কেন্দ্রীভূত জীবনী শক্তি। এদেরই একজনকে দেখে সেদিন বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন সিতেশবাবু। শান্তিকে সচেতন করে দেবেন ভেবেছিলেন। সাবধান শান্তি, হুঁশিয়ার। এদের মাঝে আছে তোমার ক্ষণজীবী সন্তান। কিন্তু সে কোন জন? অতগুলো মুখের পানে চেয়ে আলাদা করে সনাক্ত করতে পারলেন না ডাক্তার সিতেশ ঘোষাল। মামুলী কুশল প্রশ্ন করে বিদায় নিলেন।

শান্তি আর কিষণ এলো কিছু দূর।

"সাবধানে যাবেন সাহেব। বর্ষা কাল। ওনারা প্রায়ই ঘোরা-ফেরা করেন।"

সিতেশবাবুর গা ছমছম করে ওঠে।

"লাইট নেই কেন? একটা আলো জ্বেলে রাখলেই হয়?"

"মেমসাব তার কেটে দিয়েছে। কোয়ার্টারের বদলে আমি আর আমার বড় ছেলে কাজ করি। কিষণের বাবা বাগান দেখে, গাড়ি পরিষ্কার করে। এই ঘরখানা আর কলের জল ফ্রী। বিজলীর জন্য মাসে কুড়ি টাকা চেয়েছিল মেমসাব। কুড়িটা টাকা প্রতি মাসে কোত্থেকে দেবো সাহেব? কিষণের বাবা পিওনের কাজে কিই বা মাইনে পায়। এতগুলো প্রাণীর খোরাক জোগাতেই চলে যায় সব ----।"

গেট পর্যন্ত এগিয়ে এলো ওরা। রাস্তা পার হয়ে হন হন করে হাঁটতে লাগলেন সিতেশবাবু। বাড়ির দরজায় এসে দম নিলেন একেবারে। কয়েক মুহূর্ত থেমে কড়া নাড়লেন।

"কে?" বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে সুবাসিনীর গলা শোনা গেল।

"খোলো, আমি।"

ঝনাত করে হুড়কো খুলে এক পাশে সড়ে দাঁড়ালেন সুবাসিনী।

সিতেশবাবু ওঁর চোখে চশমা দেখে বললেন, "এই রাত দুপুরে আবার সেলাই নিয়ে বসেছ?"

"সারাদিন দাসীবাঁদির কাজ করে ফুরসৎ পেলে তো ! বছরে একবার পুজোয় ক'টা জামা বানিয়ে পাঠাবো তাও আর হ'বার জো নেই। সব শখ আহ্লাদই তো ঘুচে গেছে এক এক করে ----।"

প্রতি সন্ধ্যার ছক-বাঁধা নালিশের ফিরিস্তি। কিন্তু আজ আর সিতেশবাবুর মনে বিরক্তি বা বিতৃষ্ণার উদ্রেক হ'ল না। গভীর মমতাভরা চোখে, নতুন দৃষ্টি নিয়ে সুবাসিনীর দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।